তুলি-কলম

পরিবেশভাবনা : প্রাচীন সাহিত্যপাঠ

অভিজিৎ পাল

বৈদিক যুগে ঋষি উচ্চারণ করেছিলেন পরিবেশের আদিতম মন্ত্র : ''ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ/ মধু নক্তমুতোষসি মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥''

—সৎকর্মপরায়ণ মানবের প্রতি বায়ু মধুর হয়; নদী মধুময় রস ক্ষরণ করে। আমাদের কাছে ওষধিসমূহ মধুময় হোক, রাত্রি ও দিন মধুময় হোক। পৃথিবী বা ভূলোক এবং পিতৃস্থানীয় দ্যুলোক আমাদের কাছে মধুময় হোক।

শুধু এ-ই নয়, ঋগ্‌বেদের পরবর্তী সূত্রে আরও বলা আছে, অরণ্যের অধিপতি দেবতা আমাদের মধুবৎ মিষ্ট ফল দান করুন। সূর্য আনন্দপ্রদায়ক হোন। গাভীরা আমাদের নিকট সুখপ্রদ হোক। মিত্রদেব, বরুণদেব ও সূর্য আমাদের প্রতি সুখপ্রদ ও আনন্দদায়ক হয়ে উঠুন। দেবপালক ইন্দ্রদেব আমাদের সুখদায়ক হোন এবং সুবিস্তীর্ণ পাদবিক্ষেপকারী শ্রীবিষ্ণু আমাদের মঙ্গলপ্রদ হোন।

বেদের এই 'মধুমতীসূক্তম্'-এ আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে সেই সুদূর প্রাচীন খ্রিস্টপূর্ব সময়েই জুড়ে গিয়েছিল পরিবেশভাবনা কিংবা পরিবেশ-নিবিড়তার অন্য এক অভিজ্ঞান। লক্ষণীয় এই 'মধু' শব্দটি। মধু পঞ্চামৃতের একটি অমৃত। অমৃত—বাঁচার রসদ জোগায়। মধুময় হয়ে উঠুক—এই প্রার্থনার মধ্যে কোথায় যেন বলা আছে, যা আছে তা সব মধুময় নয়! এই হয়তো প্রথম সূত্র পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ারও—যাকে আমরা, একুশ শতকের পৃথিবীতে দূষণ বলে চিহ্নিত করি। দূষণ-উত্তীর্ণ পৃথিবীর জন্য তাই হয়তো একদিন ধ্বনিত হয়েছিল ভূলোক থেকে দ্যুলোক, বৃক্ষ থেকে প্রাণী—সকলের মধুময় হওয়ার আশা ও কামনা।

দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে আনুমানিক ৮০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাংলা ভাষার জন্ম। বাংলা ভাষার সঙ্গে প্রায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জন্ম তার সাহিত্যেরও। যদিও প্রাচীন বাংলার মাত্র কয়েকটি নিদর্শনই আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। সময়ের গ্রাসে কিছু হয়তো হারিয়ে গেছে বা এখনও রয়ে গেছে অনাবিষ্কৃত! হতে পারে সেইসময়ের অনেক সাহিত্যই ছিল মৌখিক—যাকে আমরা Oral Literature বলে থাকি। তাই হয়তো সুদূর নেপালের রাজদরবারের পুঁথিশালা থেকে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পেয়েছিলেন চর্যাপদ পুঁথি, যা বাংলা সাহিত্যের আদি অভিজ্ঞান। পরিবেশভাবনা বা পরিবেশকেন্দ্রিক পাঠ, বিশ্লেষণী ভাবধারা আধুনিক যুগের ফসল। আধুনিক

দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে, চর্যাপদ থেকে শুরু করে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাংলা পদ্যে বা গদ্যে যা কিছু লেখা হয়েছে, তাতে পরিবেশভাবনার কোনও স্পষ্ট ছাপ নেই! আছে শুধুমাত্র বঙ্গীয় নিসর্গপ্রকৃতির বর্ণাঢ্য চিত্রণ, ইংরেজি পরিভাষায় যাকে বলে 'নেচার রাইটিং' বা প্রকৃতিলিখন। চর্যার আরণ্যক পরিবেশ, বৈষ্ণব পদসমুদ্রে প্রকৃতির প্রতিকূল অবস্থান, মঙ্গলকাব্যের নারীদের বারোমাস্যায় ছয় ঋতুর স্বভাবী বর্ণনা শুধুমাত্র যেন প্রকৃতিচিত্রণের অঙ্গরূপে দেখা দিয়েছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের সাহিত্যেও তাই। এই কবি-সাহিত্যিকদের কেউই আধুনিক পরিবেশচিন্তার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতিকে দেখেননি। বস্তুত এই না-দেখার ত্রুটিও তাঁদের নয়।

তার অন্যতম কারণ, তখনও অবধি আমাদের দেশে, বিশেষত অখণ্ড বঙ্গদেশে, নাগরিক জীবন ও যন্ত্রমুখীন সভ্যতা আজকের মতো তার দাঁত-নখ প্রকাশিত করেনি, প্রকৃতির সহজাত নিবিড় সান্নিধ্যে মিশে থাকা আমাদের জীবনযাত্রাও মানসিক সহজ-সরল সত্তাকে গ্রাস করতে উন্মুখ হয়ে আসেনি। একথা অনস্বীকার্য যে পরিবেশদূষণ তখনও ছিল। কিন্তু জনসংখ্যার অনুপাতে তার মাত্রা অল্প ছিল বলে সহজে অনুভব করা যেত না। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও দূষণ সমানুপাতিক সম্পর্কে আবদ্ধ। পরিবেশভাবনার ক্ষেত্রে প্রাচীন সাহিত্যধারার শেষ কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে সরাসরি কিছু 'সিরিয়াস' ভাবনা দেখা যায়। তা সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আধুনিক পাঠে, যার হয়তো ক্রমবিস্তার ঘটেছে আধুনিক সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ এবং তারপর জীবনানন্দ-বিভূতিভূষণ প্রমুখের হাতে। আধুনিক কবি আলোক সরকার, রত্নেশ্বর হাজরা কিংবা ঔপন্যাসিক কিন্নর রায় স্বাভাবিকভাবেই সেই ধারার দোসর। লক্ষণীয়, মধ্যযুগের সমাজে একটার পর একটা ব্রতকথার জন্ম হচ্ছে, এইসব ব্রতের আচরণ ও উপচারও প্রকৃতিঘেঁষা। জীবনের পাঠশালার প্রকৃতিপাঠ থেকেই জন্ম নিচ্ছে হয়তো এসব প্রকৃতিভাবনা মেয়েদের হাত ধরে! ব্রতপালনেও মেয়েরাই আজ পর্যন্ত অগ্রণী।

প্রত্যক্ষ ও সচেতন পরিবেশভাবনা বাংলা সাহিত্যের প্রথম পাঠপর্বে থাক বা না-থাক, প্রকৃতি যে সাহিত্যের অঙ্গনে প্রকাশিত হয়নি, এমন নয়! কয়েকটি মূলগত বিষয় পৃথিবীর সবদেশের সাহিত্যেই বিদ্যমান। লেখক সৌন্দর্যসন্ধানী। তাঁর মন সেই আবহমান কাল থেকে প্রকৃতির দ্বারাই লালিত হয়েছে নিবিড়ভাবে। লেখকের মন ও মননের একটা অংশ জুড়ে থাকে প্রকৃতিকে দেখার চোখ। সাহিত্যে সেইসব প্রকাশ ও প্রকাশের ভঙ্গিমাকে প্রধানত তিনভাবে দেখা যেতে পারে :

১. প্রকৃতি স্বয়ং কোথাও মানবজীবনের পটভূমি-রূপে গুরুত্ব অর্জন করেছে। প্রকৃতি সেখানে অনেকাংশে সাহিত্যের ফ্রেম।

২. প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের বৈপরীত্যে কবি কাব্যশিল্পরূপ রচনা করেন। প্রকৃতিই সেখানে একমাত্র ধৃ-কেন্দ্র।

৩. প্রকৃতি কখনও সজীব সত্তায় মানবজীবনের ব্যাখ্যাকার, প্রকৃতির সেই বহুমাত্রিক, বহুবৈষয়িক ও বহুস্বরিক উপস্থিতি, চর্যাপদ থেকে ভারত-কবির অন্নদামঙ্গলে কোনও না কোনওভাবে রয়েছেই।

বাংলা সাহিত্যের জন্মলগ্নের সাহিত্যিক উপকরণ 'চর্যাপদাবলী'। চর্যাগীতিসমূহের মধ্যে মুখ্যত বিবেচ্য বিষয় ধর্মতত্ত্ব। তবে তা আপাদমস্তক গূঢ় রূপক পরিবৃত। অদীক্ষিত মানবের জন্য তা নয়। এই রূপকের মধ্য দিয়ে যে-বাহ্যিক কাহিনি-শরীর চর্যাকবিরা সাজাতেন তাতে অবশ্য প্রভাব থাকত প্রকৃতি-পরিবেশ-সমাজের। সেই সাধনতত্ত্বকথার সবকিছুর ঠিক ঠিক অর্থোদ্ধার করতে না পারা গেলেও, চর্যার পদগুলির আস্বাদন সম্ভব এইসব বাহ্যিক কাহিনিগত রসবস্তু ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যচিত্র

উপভোগে। চর্যার ২৮ সংখ্যক পদে আছে আকাশ, পাহাড়, গাছগাছালির মাঝে বেড়ে ওঠা এক শবরীকন্যার কাহিনি। উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাঝে শবরীবালিকার যে প্রকৃতিস্নিগ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে প্রকৃতি অনেকাংশে কথ্যবস্তুর পটভূমি রচনা করে।

''উঞ্চা উঞ্চা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরিহণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥''

—উঁচু উঁচু পর্বতের মাঝে শবর বালিকার বাস। তার মাথায় ময়ূরপুচ্ছ, গলায় গুঞ্জামালা।

চর্যার ৫০ সংখ্যক পদে দেখা যায় জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ প্রকৃতির টুকরো এক ছবি। অবশ্য তারপরেই জুড়ে আছে চিতায় শবদাহের বর্ণনার কথা। কার্পাসফুলের ফুটে থাকা কিংবা কঙ্গুচিনা ফসলের পেকে ওঠার যে-কথা এই পদে আছে তা নেহাতই প্রকৃতিলিখন।

''হেরি যে মরি তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।
যুকড় এবে রে কপাসু ফুটিলা॥...
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবরা শবরি মাতেলা।''

এই কপাসুই কার্পাস। চর্যায় আছে নদীবিধৌত বাংলার ছবি, নদীনির্ভর নৌবাণিজ্যের কথা। আবার প্রকৃতিবিরুদ্ধতার নিদর্শন মেলে হরিণশিকার প্রসঙ্গে। মানুষ কীভাবে নিজের প্রয়োজনের তাগিদ মেটাতে প্রকৃতির উপর ও প্রকৃতির সন্তানদের উপর আঘাত হেনেছে এ যেন তারই বার্তাবাহী। তবে এ-ছবি অতীতেও ছিল। আর্যরা ভারত আগমনের সময়ে এক তৃণভূমি, এক বনভূমি নিঃশেষ করেই আপন প্রাণ ধারণের জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন বনান্তরে। মানুষ সেই আদিমক্ষণ থেকেই অনেকাংশে পরিবেশ ও প্রতিবেশ নির্ভর। তারই এক টুকরো এবং অন্য ছবি চণ্ডীমঙ্গলেও আমরা পরবর্তী কালে পেয়েছি।

কবি জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যের কবি হলেও তাঁর অবস্থান বাংলা রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রাচীন সাহিত্যের জন্মলগ্নের সঙ্গে সংযুক্ত। তুর্কি আক্রমণের বিবিধ সমস্যার জন্য ১২০৩ বা ১২০৪ থেকে প্রায় ১৩৫০ সাল পর্যন্ত দেড়শো বছর আমরা তেমন কোনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক নিদর্শন এখনও পাইনি। এই দেড়শো বছরে কিছু লেখাই হয়নি এমন বলা চলে না, কারণ তাহলে বাংলালিপির বিবর্তন থেমে যেত। ১৩৫০-এর পর যে-কাব্যটি আদিমধ্যযুগের বার্তাবাহী, তা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য। এরই প্রত্যক্ষ না হলেও খানিক উত্তরসূরি বাংলা বৈষ্ণব পদসমূহ, এবং বঙ্গীয় ব্রজবুলি সমৃদ্ধ পদাবলি। রাধাকৃষ্ণের বহুমাত্রিক প্রেমই এই সাহিত্যধারার মুখ্য অভিমুখ। ভক্তশ্রেষ্ঠ রাধারও অন্যরূপ এখানে রয়েছে। সরাসরি সেভাবে কোনও প্রকৃতিচিত্রণ এই কাব্যে না থাকলেও বড়ু চণ্ডীদাস জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে প্রকৃতি ও পরিবেশের সাহায্য নিয়েছিলেন রাধাকৃষ্ণের প্রেমের তাগিদ ও জটিলতাকে নির্মাণ করে তুলতে। বিপুল বৈষ্ণব পদসাহিত্যও তার বাইরে নয়। তাই এসেছে রাধার জ্যোৎস্না অভিসার, তমসা অভিসার, বর্ষা অভিসারের অসামান্য কিছু পদরত্ন। সেখানে প্রকৃতি যেন বিঘ্ন সৃষ্টি করছে আবহমান কালের সেই মহান দুই প্রেমাস্পদের মিলনে। এর বৈষ্ণবীয় ভাবসমৃদ্ধ ব্যাখ্যা অতীব অমৃতভাষ্য! যাই হোক, তবু এই কাঠিন্য পেরিয়ে তবে রাধার অভিযাত্রা। বৈষ্ণবীয় তত্ত্বাদি না বুঝে এইসব পদের ব্যাখ্যা অসাধ্য। রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জবিলাসের ছবিতে লেগে থাকে প্রকৃতিনিবিড়তার এক নিরলস ছবি। তাঁদের পবিত্র প্রেম উদ্‌যাপনের জন্য রাধার সখীরা সাজিয়ে তোলেন উদ্যানবাটিকা। এই একবিংশ শতকেও শহরে বেশ কিছু উদ্যানবাটিকা প্রকৃতিজ করে রাখার প্রচেষ্টা হচ্ছে, তার সূত্রে কি মনে হয় না যে, পদাবলির এই ছবি বড় আধুনিক প্রত্যয়ী! প্রেমের স্রোতে আরও একটা ছন্দ তুলতেই যেন এমন এক প্রকৃতিচেতনার উদ্ভাবন ঘটেছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ও বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে তথা ভাগবতেও দেখা যায়

বিষধর কালীয় নাগ দমনের প্রসঙ্গটি। এতে বিশেষ অলৌকিকতা ও শ্রীকৃষ্ণের দেবত্ব আছে। হয়তো এখানে পরিবেশভাবনার প্রত্যক্ষ ছবি নেই, কৃষ্ণের দৈবী মহিমারই ব্যাখ্যা বেশি। তবে লক্ষণীয়, কালীয় নাগ যমুনার জলদূষণ ঘটিয়েছিল। বিপন্ন হয়েছিল বৃন্দাবন! তাই কালীয়দমনের এই প্রসঙ্গটিকে আধুনিক দৃষ্টিতে জলদূষণ রোধের চিত্র বলে মেনে নেওয়া খুব দুরূহ কাজ কি?

প্রকৃতিনিমগ্নতার হাত ধরে বৈষ্ণবপদে এসেছে রাধার মাথুর পর্যায়ের বিরহগাথা, যা সেজে উঠেছে প্রকৃতির বর্ণমালায়। ভরা ভাদ্রদিনে বিরহের জ্বালা, কিংবা তপনতাপে অঙ্কুরের নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঘটনাও কবিদের অবচেতনে লুকিয়ে থাকা প্রকৃতির টুকরো ছবির বার্তাবাহী, অন্য এক স্বপ্নদোসরের অভিজ্ঞান।

প্রাগাধুনিক সাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে অনুবাদ সাহিত্য। সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্‌ভাগবত মূলত অনূদিত হলেও পাশাপাশি অনুবাদ হয়েছিল আরও কিছু কাব্যের। সেই তালিকাও নেহাত কম নয়। তবে এসব কাব্যের ক্ষেত্রে যে-প্রকৃতিচেতনা রয়েছে তার কতটা বাংলার প্রাক্-ঔপনিবেশিক মধ্যযুগীয় সময়ের সংযোজন তা নিয়ে স্বল্প পরিসরে আলোচনা অসাধ্য। তুলনামূলক সাহিত্যবিচারে এ-বিষয়ে গবেষণাপত্র তৈরি হওয়া সম্ভব। তবে সাধারণ দৃষ্টিতে রামায়ণে রামের বনবাস অংশে প্রকৃতির এক নিবিড় বনায়ন লক্ষ করা যায়। রাজা দশরথের মৃগয়া, মুনিদের বননির্ভর জীবনযাপন, বানরদের আত্মগোপন থাকার সময় বনযাপন প্রাচীন সাহিত্যেও বিরল নয়। তবে অল্প হলেও এইসব অনুবাদকাব্যে মধ্যযুগের কবিদের প্রকৃতিভাবনা কাজ করেছে। কারণ বনের বর্ণনায় এমন কিছু দৃশ্য ও গাছের বর্ণনা পাওয়া যায় যা বঙ্গের বাইরে চোখে পড়ে না এবং মূল রামায়ণে নেই। বলাবাহুল্য রামায়ণের একটি কাণ্ডের নাম আরণ্যকাণ্ড (মতভেদে অরণ্যকাণ্ড), মহাভারতের একটি পর্বের নামও বনপর্ব। বনপর্বেও অন্যান্য টুকরো টুকরো ছবি, গোধন বিষয়ে কথাবার্তা, ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মাণ, খাণ্ডবদহন সহ নানা প্রসঙ্গে পরিবেশভাবনার এক-একটি দিক ধরা পড়ে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুবাদের বৃন্দাবন অংশে গিরি গোবর্ধন বন্দনা, গোচারণ, কালীয়দমন প্রভৃতি প্রকৃতিনির্ভরতারই লক্ষণ। সেখানে স্বর্গের দেবতা ইন্দ্রের বদলে শ্রীকৃষ্ণ পর্বতের অর্চনার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন এবং স্পষ্টবাক্যে বলছেন, গিরি গোবর্ধনই বৃন্দাবনের সম্পদ। এই পর্বতপূজাও প্রকৃতি-নির্ভরতারই লক্ষণ। আধুনিক বিশ্বে বৃক্ষপূজা, প্রস্তরপূজা, নদীপূজা, পশুপূজা অবৈজ্ঞানিক মনে হওয়া স্বাভাবিক, মনে হতে পারে মানুষ কেন মানবেতর প্রাণী ও জড়ের উপাসক হবে! কিন্তু ভেবে দেখা যেতে পারে, হিন্দুধর্মের সঙ্গে প্রকৃতিভাবনার অঙ্গাঙ্গী সংযোগের মধ্যে লুক্কায়িত আছে পরিবেশচেতনা, পরিবেশ ও প্রাণিসংরক্ষণের নিরলস প্রচেষ্টা।

মঙ্গলকাব্য আপাদমস্তকই বাংলার ফসল, এর দু-একটি শাখাকাহিনি অন্যভাষা ও অন্যপ্রদেশ থেকে এলেও তার বঙ্গীয় সংস্করণ এমনভাবে ঘটেছে যে, তা আদতে বাংলার সম্পদ হয়ে উঠেছে সময়ের অভিযাত্রায়। বঙ্গময় বিস্তার লাভ করেছিল মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনি। এরপরেই রয়েছে ধর্মমঙ্গল, অবশ্য তার প্রসার মূলত রাঢ়বঙ্গে। মনসামঙ্গলের কাহিনিতে জালু-সালুর জীবন নদীকে কেন্দ্র করে সৃজিত। মীন ধরার সূত্রেই তারা একদিন পেয়েছিল দেবীর কৃপা। মানুষ কীভাবে নিজের অবচেতনে ও সচেতনে প্রকৃতিকে এবং পরিবেশের সুজলা-সুফলা-সুশোভিত দিকগুলির উপর পরম নির্ভর করে জীবন ও জীবিকা ধারণ করে নেওয়ার সূত্র খুঁজে পেয়েছে, তারই প্রমাণ এই দুই মানুষ। মনসা সাপের দেবী হলেও তিনি উর্বরা

শক্তির প্রতীক। অর্থাৎ মনসার এই ভাবনা ও দৈবীসত্তার সঙ্গে জুড়ে আছে অন্যতর এক পরিবেশভাবনা। অন্যদিকে ভাবা যেতে পারে চাঁদ বণিকের নাখরা বন ধ্বংসের ছবিটি। ভেষজ ওষধিতে সমৃদ্ধ এই বন ছিল চাঁদ বেনের সমৃদ্ধির পরিচায়ক। বনটি জোর করে ধ্বংস করা হয়েছিল। স্বার্থের জন্য বনধ্বংসের ছবি আজও তো বিরল নয়। আবার ভাবা যেতে পারে চাঁদ বেনের এই বনের পুনঃস্থাপন সামাজিক বনসৃজনেরই দৃষ্টান্তস্বরূপ। বেহুলার কলার মান্দাসে জলে ভাসার সময়ে যেসব টুকরো টুকরো পেশার মানুষ আমরা দেখতে পাই, তাদের অধিকাংশই শ্রমজীবী এবং তারা বেশিরভাগই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' পড়তে গিয়ে যে-নদীনির্ভর জীবনের আমরা মুখোমুখি হই, এ যেন তারই প্রাগ্‌ভাষ্য। মঙ্গলকাব্যের ধারায় দ্বিতীয় স্রোতস্বিনী নদী চণ্ডীমঙ্গল কাব্য। কালকেতু-পালায় যে-জীবনালেখ্য আমরা পাই তা সম্পূর্ণাংশে পূর্ণায়তভাবে প্রকৃতিনির্ভর। কালকেতু ব্যাধ, পরিবেশ তথা অরণ্যমধ্যে সচল থাকা প্রাণীরাই তার জীবিকা পরিচালনার প্রথম ও শেষ ভরসা। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর মধ্যে কালকেতু ব্যাধের কাহিনিতে কালকেতুর শিকারপর্বটি এক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয়। কাহিনিতে প্রাণীরাই শেষ পর্যন্ত শরণাপন্ন হয়েছে দেবী চণ্ডীর। দেবী সদয়া হয়ে এগিয়ে এসেছেন ব্যাধ কালকেতুর হাত থেকে পশুদের রক্ষা করতে। এর মধ্যে প্রাণিসংরক্ষণের প্রচ্ছন্ন ছায়াপাত রয়েছে। কালকেতুর এহেন প্রকৃতিনির্ভর জীবনযাপন ব্যাহত হয় দেবীর অহেতুকী কৃপা পেয়ে গুজরাত নগরপত্তনের হাত ধরে। এর পূর্বে রয়েছে বনকর্তনের এক অধ্যায়। কবি তালিকাকারে উপস্থাপিত করেছেন অনেক গাছের নাম, একের পর এক গাছ থেকে নগর নির্মাণের কিছু সামগ্রীও কালকেতুর সংগ্রহ করা এ-পর্যায়ে কষ্টসাধ্য নয়। কবির নগরপত্তনের বর্ণনার ঝোঁক এতটাই প্রবল যে, বনবিনাশের এই ছবিটি আমাদের চোখে তেমন কটু লাগেনি। অবশ্য এক্ষেত্রে বলতেই হয় কালকেতু-ফুল্লরা তাদের প্রকৃতিসান্নিধ্যের জীবন ছেড়ে বেরিয়ে আসার পরই তাদের জীবনে এসেছে নাগরিক জটিলতার কালো দাগ। পরিবেশবিরুদ্ধতারও যেন একপ্রকার শাস্তি পেয়েছে তারা। ধনপতির উপাখ্যানে বিধৃত খুল্লনার বনযাপনে অভাগী হয়ে থাকার কাহিনি, সেখানে বন কিন্তু নির্ভরতারও প্রতীক। তবে সেটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণে। ধনপতির সিংহলযাত্রা ও চাঁদ বণিকের বাণিজ্যযাত্রার উপকরণগুলিও লক্ষ করার মতো। তারা মূলত সেইসব সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করে, যা অন্যত্র অপ্রতুল। অর্থাৎ পরিবেশ ও প্রকৃতি জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে মানুষের ভোগবাদী জীবনের সঙ্গে কীভাবে মিশে যায়, এই অংশটি তারই বার্তা বহন করে। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনিতেও কিছু কিছু ছবিতে ধরা আছে রাঢ়বঙ্গের দৃশ্য। তার কারণ অবশ্য ধর্মমঙ্গল প্রসার পেয়েছিল রাঢ়বঙ্গেই!

শিবায়ন বা শিবমঙ্গল কাব্যের কাহিনিতেও দেখা যায় কীভাবে পরিবেশ মানুষের মনে প্রভাব ফেলে এবং কীভাবে তাকে কর্মমুখী করে তোলে। শিব দেবতা হলেও এই কাব্যে তাঁর পেশা কৃষি। কৃষির সূত্রে মিলে যায় পরিবেশ এবং তার সূত্রেই মিশে যায় দেবতার মানুষ হয়ে ওঠার অন্য এক আলেখ্য। বনবিবি ও দক্ষিণরায়ের কাহিনি আসলে প্রকৃতির হাত ধরে সৃষ্টি হওয়া দেবতারই খবর দিয়ে যায় নতুনপাঠে। বনবিবি বনের দেবী, প্রকৃতি দেবী। এই প্রকৃতিবিধৌত দেবীই কোথাও কোথাও নামভেদে বনদুর্গা নামে পরিচিত। আর দক্ষিণরায় বন্যপ্রাণী বাঘের দেবতা। অন্নদামঙ্গলের কবি তথা বাংলা মঙ্গলকাব্য ধারার শেষ শক্তিমান কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যেই প্রথম ও সার্থকভাবে লক্ষ করা গেছে প্রায় আধুনিক পরিবেশভাবনা। দেব-কারিগর বিশ্বকর্মাকে

দিয়ে অন্নপূর্ণাপুরী নির্মাণের সময় ভারতচন্দ্র সব প্রাণী ও উদ্ভিদকে মান্যতা দিয়েছেন। পরিবেশে তিনি পারিজাত থেকে অতসী, আম থেকে হরিতকী, ময়ূর থেকে শকুন, সিংহ থেকে ইঁদুর, নানা সাপ থেকে পিঁপড়ে পর্যন্ত সকলস্তরের জীববৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। আবার,

''সরোবর বনশোভা দেখি সুখী শিব।
জীবন্যাসমন্ত্রেতে সবার দিলা জীব॥''

কবি সব প্রাণীকেই মান্যতা দেওয়ার চেষ্টা করছেন সচেতনভাবে, অথচ সাজাচ্ছেন এক নগর। নগরায়ণও হবে আবার বনসৃজনও হবে পাশাপাশি—এই হল কবির অভিপ্রায়! আজকের দিনে নগরায়ণের পাশাপাশি যখন আমরা বিজ্ঞানের হাত ধরে জোর করে নানা প্রাণী সংরক্ষণের প্রয়াস করছি, তার বহু শতক আগে ঔপনিবেশিক আধুনিকতা আসার আগেই মধ্যযুগের আবহে এক রাজসভার কবি পরিবেশ-সংক্রান্ত এমন ভাবনা ভেবেছেন দেখলে অবাক হতে হয়। পরিবেশের ভারসাম্য ও প্রকৃতির বুকে নিয়ত সচল থাকা বাস্তুতন্ত্র যেন বিঘ্নিত না হয়, তার জন্য বাহ্যিক দিক থেকে আপাতসুন্দর ও কদর্য সব প্রাণীই পাচ্ছে সমান মান্যতা। প্রকৃতি মানবমনে প্রভাব ফেলে অনেক ভাবে। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত তার প্রমাণ। কোন রাগ কোন ঋতুতে কখন এবং দিন-রাতের কোন প্রহরে গীত হতে পারে তার সুনির্দিষ্ট উল্লেখ পর্যন্ত রয়েছে সেখানে। পরিবেশের সঙ্গে মানুষের যে-ঐকতান এ হল তারই এক সুস্পষ্ট ছবি। মঙ্গলকাব্যের বারমাস্যায় সেইরকম এক ভাবনা লক্ষ করা যায়। ড. সনৎ কুমার নস্কর বলেছেন,

''... পৃথিবীর বার্ষিক গতির প্রভাবে ঋতু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক জগতের রূপ যেমন পালটে যায়, তেমনি তার প্রভাবে মানুষের মনোজগতেও রূপান্তর ঘটে। একদা প্রকৃতি ছিল মানুষের একমাত্র সহচর। কৃষিভিত্তিক সমাজে প্রকৃতির প্রভাব ও গুরুত্ব সর্বব্যাপক ছিল। পণ্ডিতদের ধারণা, কৃষিকেন্দ্রিক প্রাচীন সমাজ থেকে একসময় বারমাস্যার মতো সাহিত্য-প্রকরণের আবির্ভাব ঘটেছিল।... বাংলা মঙ্গলকাব্যের কবিরা বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলিকে প্রেক্ষাপটে রেখে কাব্যের নায়ক-নায়িকার মনের নানাবিধ অনুভূতিগুলিকেই তুলে ধরতেন। বারমাস্যা মুখ্যত নারীজীবনাশ্রিত সঙ্গীত হিসেবে মঙ্গলকাব্যে যুক্ত হয়েছে।''

'মৈমনসিংহগীতিকা'র মধ্যেও রয়েছে পরিবেশভাবনার এক প্রচ্ছন্ন ছবি। মহুয়া পালায় পার্বত্য অঞ্চল, অরণ্যের একান্ত ছায়ার ছবির পাশাপাশি গৃহ-সংলগ্ন এক প্রাকৃতিক মুগ্ধবোধের পাঠ সাজানো হয়েছে চন্দ্রাবতী সহ অন্যান্য কয়েকটি পালাকাহিনিতে। কখনও চরিত্রগুলির নতুন ভাষ্যকার হয়ে উঠেছে বঙ্গ-প্রকৃতি-পরিবেশ।

চৈতন্যজীবনীসাহিত্য মধ্যযুগের অন্যতম কাব্যশাখা হলেও, তা প্রথমত ও শেষত সন্তজীবনী। তাই স্বাভাবিক নিয়মেই সেখানে মূল প্রতিপাদ্য মানব চৈতন্যদেবের দিব্যজীবন। কবিরাও তাই বেশি চরণ ব্যয় করেননি প্রকৃতি বা পরিবেশ বর্ণনায়। পরিব্রাজক শ্রীচৈতন্যের বর্ণনায় কিছু ক্ষেত্রে প্রকৃতি স্বভাবতই এসেছে কবিকলমের আনন্দে। এই সাহিত্যধারাটি ভাবসমৃদ্ধ, কাজেই বর্ণাঢ্য প্রকৃতি বা পরিবেশ উপস্থাপন সেখানে গৌণ।

মধ্যযুগীয় সময়কালেই গড়ে উঠেছিল একটার পর একটা ব্রতকথা ও ব্রতপদ্ধতি। এর মধ্যে পুণ্যিপুকুর, গারসি, গোকুল, যমপুকুর, ইতু, কুলকুলতি, অশোক ষষ্ঠী সহ ছিল বাংলার নানা জনপ্রিয় ব্রত। এগুলির মধ্যে কিছু কিছু এখনও গ্রাম ও শহরে পালন করেন মায়েরা। ব্রতের সঙ্গে জড়িত থাকে ব্রতের ফল, যা সাধারণত সমৃদ্ধির কামনা। বঙ্গদেশে ধনসম্পদ বলতে সাধারণ মানুষের কাছে কখনও অর্থ ছিল না, তাদের কাছে ধন জমানো

মানে ধান জমানো, আর সম্পদ সাধারণত ধানিজমি। ধানই তাদের ধন। এ তো প্রকৃতিনির্ভরতা ছাড়া আর কিছু নয়। এইসব ব্রতের ছড়া মূলত ছিল শ্রুতিনির্ভর। অনেক পরে যখন বাঙালি নিজ সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়েছে, তখন এই ছড়াগুলি সংকলিত হয়েছে দু-মলাটের মধ্যে। এইসব ব্রতের ছড়াগুলি মধ্যযুগীয় লোকসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এগুলি বিস্তর গবেষণার দাবি রাখে। এইসমস্ত ব্রতকথাগুলির মধ্যে কোনও ব্রতে বানানো হয় ছোট পুকুর, কোনও ব্রতে সাজানো হয় গাছ, কখনও কিছু প্রাণী। গোকুল ব্রতের উপকরণ ও পন্থা গোধনকেন্দ্রিক। বঙ্গের এইসব লোকাচার ও ব্রত মূলত সবই বৃক্ষ, প্রকৃতি, প্রাণীদের নিয়ে। মন্ত্র বা ছড়ার সঙ্গে সংস্কৃত বা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কোনও সম্পর্ক নেই। প্রকৃতি সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য নিয়ে বাঁচা, জল বাঁচানোর হয়তো এমন রূপক আরও অনেক ব্রতে লুকিয়ে আছে এখনও। বঙ্গের অনেক ব্রতই চর্চার অভাবে হারিয়ে গেছে কালের অতল গহ্বরে। মেয়েরা মধ্যযুগে পরিবেশবিদ্যার পাঠ হয়তো নেননি, তবে পাঠ নিয়েছিলেন জীবনের পাঠশালা থেকে, নিজেদের মতো করে, প্রকৃতির জন্য। আমাদের প্রকৃতির জন্য, পরিবেশভাবনার এই লোকায়ত বিশ্বটি, স্বাভাবিক সরল সুন্দর ভাবনাটি কর্মগুণেই বৃহৎ ও মহৎ।

প্রাগাধুনিক সাহিত্যে কবিদের অবচেতনেই বারবার এসেছে প্রকৃতি তথা পরিবেশ। তাঁরা কেউই আজকের বিজ্ঞানসম্মত ইকো-ক্রিটিসিজমের তত্ত্ব জানতেন না। আধুনিক সাহিত্যবিচারে যে-পরিবেশভাবনা ও পরিবেশকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমরা মুখোমুখি হই, তা প্রাচীন সাহিত্যে প্রত্যক্ষত ছিল না। কবি প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতির অদ্ভুত একটা হৃদ্যতা জুড়ে থাকে কবির সঙ্গে। প্রকৃতির সঙ্গেই তাঁর নাড়ির যোগ বেশি। তাই সরাসরি হোক অথবা চরিত্রসৃজন বা কাহিনিসৃজনের সৌকুমার্যেই হোক, তাঁর সৃষ্টিতে ধরা পড়েছে প্রকৃতির এক অন্যপাঠ। সেই পাঠান্তরের সূত্র ধরেই আজ পরিবেশভাবনার দরজায় আমাদের কড়া নাড়তে যেতে হয় উত্তরাধিকারকে মান্যতা দিয়ে। প্রাচীন সাহিত্য প্রাচীন সাহিত্যই, তার বেঁচে থাকা তার নিত্যনতুন পাঠ আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। ইকো-ক্রিটিসিজমের ধারণা নতুন, এ-বিষয়ের ভিত্তিতে সমগ্র প্রাচীন সাহিত্যের নতুন পাঠ এই মুহূর্তে আবশ্যিক। আগামীর জন্য সেই প্রত্যাশা রাখলাম।✠

ঋণস্বীকার

ড. সনৎকুমার নস্কর, অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর একটি বক্তৃতা শোনার পর এই ভাবনা উপস্থাপন সম্ভব হয়েছে।

ড. মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা, অধ্যাপিকা, দীনবন্ধু এনড্রুজ কলেজ। তাঁর আলোচনা ও পরামর্শে উপকৃত হয়েছি বিশেষভাবে।